শ্যামল সাহিত্যে বাদাজীবন

অনিল ঘোষ

প্রশ্ন হল, লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে আমরা কোন রূপে চিনব? কোন তকমায় তাঁকে ধরব? কোনও একটা ক্ষেত্রে তাঁকে তো ধরা যাচ্ছে না। যতবারই ধরতে যাচ্ছি, মুচকি হেসে পিছলে যাচ্ছেন। বলছেন, হেথা নয়, অন্য কোনও খানে। কোথায় তিনি ধরা দেবেন? প্রথম জীবনে কারখানার লোহা-লক্কড়, আগুনের উত্তাপে যিনি স্বেদ-রক্ত ঝরাচ্ছেন, সেই শ্যামল? নাকি সংবাদ প্রতিষ্ঠানে অক্ষরের প্রাসাদ গড়ছেন, সেই শ্যামল? আবার তাঁকেই দেখছি মহানগরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে, ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে সুদূর সুন্দরবনের গাঁ-ঘেঁষা জনপদে চলে গেলেন বসবাস ও নিজের হাতে চাষবাস করতে, জমির নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে। শ্রমিক থেকে তিনি জোতদার চাষী হয়ে গেলেন। তিনিই আবার পরবর্তী জীবনে হয়ে গেলেন শুধুমাত্র অক্ষরজীবী। সাংবাদিকতা, পত্রিকা সম্পাদনা—এও তো শ্যামল। শেষ পর্বে দেখছি তিনি পরিব্রাজক হয়েছেন। হাঁটতে শুরু করলেন বাংলার হাট-বাজারে, অর্থনীতির হাল হকিকত নিজের চোখে দেখবেন বলে। আবার তিনিই হাঁটতে শুরু করলেন ইতিহাসের ধূলি ধূসরিত পথে, ভারত সম্প্রীতির প্রতীক শাহজাদা দারাশুকোর জীবনভিত্তিক উপন্যাস রচনার লক্ষ্যে।

তাই, প্রশ্ন স্বাভাবিক নিয়মেই আসে। তাহলে কোন শ্যামল সত্য? কোনও লেখক, তিনি যেমনই হোন, তিনি চাইবেনই তাঁকে বহুরূপে পাঠক চিনুক, জানুক, বোঝার চেষ্টা করুক। আমাদের যেমন পোশাক বদলাবার অভ্যাস থাকে। এক ছাঁচ, এক মাপের আবরণে থাকতে মন চায় না। তেমনি লেখকও চান বিভিন্ন সময়ে তিনি যেন উদ্ভাসিত থাকতে পারেন, কালের কষ্টিপাথরে ঘষা খেয়ে যেন বরাবরই বেঁচে ফিরতে পারেন। এ চাওয়ায় কোনও অন্যায় নেই। অমরত্ব কে না চায়। *'এসেছিস যখন দাগ রেখে যা'*—শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ বাণীর মর্ম কে না বোঝে। কে না মনে মনে আশা করে আমার সৃষ্টি যেন বেঁচে থাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে। তাই তো জীবনটাকে বারবার ছেনে বেছে নেওয়া। কেননা জীবনসত্যের প্রতিফলন সৃষ্টিকর্মে পড়বেই। লেখকও মানুষ। তাঁর স্বভাব-অভ্যাস, চলন-চারণ—সবকিছু নিয়েই তাঁর সাহিত্য সংসার। সবকিছুরই প্রতিফলনে গড়ে ওঠে একটি মহান সাহিত্য। মিথ্যাচার দিয়ে আর যাই হোক, মহৎ কিছু সৃষ্টি করা যায় না।

এখানে স্বাভাবিকভাবেই একটা কথা মাথায় আসে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই জীবন-বৈচিত্র্য, তা কি শুধু সাহিত্য করার লক্ষ্যে, নাকি নিজের ভিতরে অবাধ বাউণ্ডুলেপনাকে প্রশ্রয় দেওয়ার তাগিদে? আর তারই প্রতিফলন কি ঘটল তাঁর

অক্ষর-সংসারে? এ তো সত্যি যে, শ্যামল নিছক ঘরে বসে কলমে শব্দ ঝরাননি। তিনি জীবনকে চলতে দিয়েছেন মাটির শরীরে, ধুলো কাদায়। বঙ্কিমের সেই অমোঘ প্রশ্ন—*'এ জীবন লইয়া কি করিতে হয়'*? তারই প্রকাশ্য উত্তর বুঝি শ্যামল নিজে। নিছক কলমজীবী না হয়ে জীবনকে ঘেঁটে, ছেনেছুনে, বারবার ভেঙেচুরে পৌঁছতে চেয়েছেন কোনও এক অনিবার্য ফলশ্রুতির দিকে। তবে, এখানে আমরা শ্যামলের জীবনধারা বিচার করতে বসছি না, বরং সেই জীবনধারা থেকে বেরিয়ে আসা সৃষ্টিই আমাদের আলোচনার মূল লক্ষ্য, আর তা মূলত সুন্দরবনভিত্তিক জীবন ও কর্ম বিষয়ে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় দূর থেকে সুন্দরবন দেখেননি বা তার কথা লেখেননি। তিনি এখানে বাস করেছেন, নিজের হাতে চাষবাস করেছেন। সেইসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ফসল ফলিয়েছে তাঁর সাহিত্যে। 'কুবেরের বিষয় আশয়', 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা'—এই পর্বের প্রধান উপন্যাস। বলা যেতে পারে বাংলা সাহিত্যে গ্রামভিত্তিক এপিক উপন্যাস। যেখানে সুন্দরবনকে নতুন ভাবে দেখার একটা প্রয়াস অবশ্যই আছে। তবে একটা প্রশ্ন বারবারই উঁকিঝুঁকি মারে মাথায়। শ্যামল কি সাহিত্য করবেন বলে সুন্দরবনে বাস করতে এসেছিলেন, নাকি জমি কিনে চাষবাস করে একটা নতুন জীবন পাবেন বলে বাদা জীবনে প্রবেশ করেছিলেন? উত্তর এখনও অধরা।

শ্যামল যখন সুন্দরবনে বাস করতে এলেন, তখন তিনি আদ্যোপান্ত নাগরিক মানুষ। এখানে একটা কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, আপাদমস্তক শহুরে মন নিয়ে গ্রামে বাস করতে এলে এক ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকেই। সেটা মেলবার, মিশবার। শহুরে মনের সঙ্গে গ্রামের মনের কোথাও একটা দূরত্ব থাকেই। একটা দেখনদারি ব্যাপার রয়েই যায়। শহর যেমন দেখাতে চায়। হাবভাব, আচার-আচরণ, কথাবার্তায়, আদব-কায়দায় যেন জৌলুস রমরম করতেই থাকে। গ্রাম সেখানে দেখে নীরবে। এই দূরত্ব কিছুতেই যেন কাটতে চায় না। আমি নিজে গ্রাম জীবনে বসবাসের কারণে এই সমস্যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। পদে পদে বোঝা যায় কোথাও একটা কমপ্লেক্স কাজ করে। হয়তো আধুনিক শিক্ষা এই দূরত্ব রচনার অন্যতম কারণ। নিজেদের জায়গায় তারা সেরা—এটা প্রমাণের একটা প্রয়াস তাদের মধ্যে বরাবরই লক্ষ করেছি। থাকবে না কেন। গোটা সুন্দরবনে মানুষের ইতিহাস তো এই শ্রেষ্ঠত্ব নিয়েই।

সুন্দরবন মানে কি? এক বিশাল বনভূমি। নদী-নালা-খাল-বিলে পূর্ণ। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, সরেস জমির বাহার, ফসলের ভাণ্ডার, সর্বোপরি মেহনতকারী মানুষের ভিড়—এই সবকিছু সংক্ষেপে সুন্দরবনের পরিচয়। সুন্দরবন, স্থানীয় ভাষায় যাকে বাদাবন বলে, সেই বাদা থেকে আবাদ করার কাজটা একদিনে, হঠাৎ করে হয়নি। এর পিছনে আছে দীর্ঘদিনের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মেহনতের

ইতিহাস, আছে অনেক কান্না-ঘাম-রক্ত ঝরার ইতিহাস। প্রকৃতির সঙ্গে, বাঘ-শ্যাল-জিন-দানোর সঙ্গে দাঁতে-নখে লড়াইয়ের ইতিহাস। এখানে দ্রারিদ্র্য-বঞ্চনা-শোষণ যেমন আছে, তেমনই সেইসব থেকে মুক্তির জন্য লড়াই-আন্দোলনের ইতিহাসও তো কম নয়। তবে সুন্দরবন যে এক বিশাল লাভজনক অঞ্চল, একে ঠিকমতো পরিচর্যা করতে পারলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই—এ সত্য কিন্তু কোনও ভারতীয় শাসক বোঝেনি। তাই ভারতীয় শাসকদের শাসনকালে সুন্দরবন একরকম অবহেলিতই ছিল। যা কিছু সামান্য প্রতাপ দেখাতে পেরেছিল, সে যশোর রাজাদের আমলে, বিশেষ করে প্রতাপাদিত্যর সময়। তিনি মোগলদের কাছে পরাস্ত হলেন, সুন্দরবন আবার চলে গেলো সেই বিস্মৃতির অন্ধকারে। এর একটা কারণ বোধহয় সুন্দরবনের নোনা জমির ভঙ্গুর অবস্থান, ভাঙন প্রবণতা, বন্যা-ঝড়, রোগভোগ-মহামারী—এইসব কারণ এই বনময় অঞ্চলকে প্রায় মনুষ্যবাসের অনুপযোগী করে তুলেছিল।

সুন্দরবনের সত্য বুঝেছিল ইংরেজরা। এই অঞ্চল যে সম্পদের স্বর্ণখনি, পাহাড়প্রমাণ মুনাফার জোগানদার—এই সত্য বুঝতে পেরে ইংরেজ শাসক সুন্দরবন উন্নয়নে নজর দেয়। জঙ্গল হাসিল করার কাজ, বাদা থেকে আবাদ করার কাজ সেই আমলেই শুরু হয়। নদীবাঁধ, রাস্তাঘাট নির্মাণ শুরু হয়। এইসব কাজ ছিল সুন্দরবনকে মানুষের বাসোপযোগী করার লক্ষ্যে। জমির বন্টন, লবণ শিল্পের মদত দিয়ে ইংরেজ এখানে যথেষ্ট লাভবান হয়েছিল সন্দেহ নেই। তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু ভুল ছিল না। সুন্দরবনে সেই থেকে বাইরের মানুষের প্রবেশাধিকার ঘটে। কোথা থেকে না মানুষ এসেছে। সেই ছোটোনাগপুর, মেদিনীপুর থেকে শুরু করে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষের আসা যাওয়া চলতেই থাকে। সবাই এসেছিল পেটের টানে, রুটিরুজির আশায়। মন্ত্র ছিল একটাই—জঙ্গল হাসিল করো। জঙ্গল হাসিল হলে জমিন মিলবে, জমিন মিললে চাষ হবে। চাষ হলে ফসল পাবে, ভাত পাবে। সুন্দরবনের মানুষের মূল লড়াইটা ছিল এই ভাতের। এখানে তারা যে কাজ করেছে, সেটা যেমন পরিশ্রমের, তেমনই এও সত্য যে, এই বাদা থেকে আবাদ গড়ে ফসলের এক বিরাট ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিল। আর সেই মানুষগুলোকে শহুরে মানুষ তথাকথিত আধুনিকতায় বলীয়ান হয়ে 'আবাদে' তকমা দিয়েছে। দিয়েছে ব্যঙ্গ করে, বিদ্রূপ করে। বোকাসোকা, হাবা গোছের মানুষ হলেই শহুরে চোখে সে আবাদে। কিন্তু তাদের জায়গায় যে তারা সেরা এ কথা একবার কেন, বারবারই প্রমাণিত। তারা মাঠ চেনে, মাটি চেনে, আকাশের ধরনধারণ বোঝে। শহুরে বাবুরা দুদিনের জন্য যাবে, এটা কী, ওটা কেন জিজ্ঞেস করবে। যা গ্রামের সহজাত, সেসব বিষয়ে কথা বললে হাসি আসবেই। তাই প্রকাশ্যে না হলেও একটা অবজ্ঞা, উপেক্ষার

ব্যাপার রয়েই যায় শহরের প্রতি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় কি এই সমস্যাটা বুঝেছিলেন? তাই কি গ্রামে বসবাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ? তিনি সংবেদনশীল লেখক। তাঁর পক্ষে এটা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। এটা ঠিক যে, তিনিও বহিরাগত। তবে এও ঠিক যে, তিনি মিলতে চেয়েছেন, মিশতে চেয়েছেন। তাঁর লেখা যদি মন দিয়ে অনুধাবন করা যায়, তবে একটা সত্য কিন্তু বেরিয়ে আসবেই, সেটা হল সুন্দরবনের গ্রাম বা প্রকৃতি নয়, সেখানকার মানুষের মধ্যেকার মানুষকে খোঁজা। সে মানুষ কেমন? খানিকটা রহস্যে ঘেরা, কিছুটা দার্শনিকতায় মগ্ন। দুঃখ-দারিদ্র্যের পাশাপাশি এইসব বিচিত্র মনের মানুষই তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে, আর এখানেই তিনি স্বতন্ত্র। 'বোকা ডাক্তারের দুই রুগী' ও 'দখল' গল্পের দাক্ষী, 'পরী' গল্পের বিপিন বিশ্বাস, 'চন্দনেশ্বরের মাচানতলায়' গল্পের অমৃত— এরা সকলেই বাদা জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে যে যার নিজের মতো করে, যা অন্য কারও সঙ্গে মেলে না। মানুষের মধ্যেকার এই বিচিত্র মানুষই তো শ্যামলের সাহিত্যের বিশিষ্টতা দাবি করে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় জনপদের সেই অংশ বেছে নিয়েছেন, যেখানে আধুনিকতার ছোঁয়া সবে লেগেছে। একদিকে চিরাচরিত গ্রাম, অন্যদিকে কলকাতার নিঃশব্দে এগিয়ে আসা—ফলে বদলে যাচ্ছে জনপদের চেহারা, তার সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশ। লেখক এই বদলে যাওয়া পৃথিবীর কথা শুনিয়েছেন 'দখল' গল্পের শুরুতে— *"কলকাতা থেকে ছেচল্লিশ কিলোমিটার গিয়ে রেললাইন শেষ। তারপর কয়েকখানা লঞ্চ আছে। সেসব না-থাকারই মতো। কেননা, এদিকটায় এত নদী, এত খাল, তারই ফাঁকে ফাঁকে এখানে সেখানে এত ঘর গেরস্থালি যে সব জায়গায় লঞ্চ যায়ও না। জায়গাগুলোর নানা রকমের নাম। লাট অঞ্চল। কেউ-বা বলে বাদা এলাকা। কেউ বলে আবাদ।...*

ন্যাশনালাইজেশনের পরে আমাদের এদিকটায় একটা ব্যাংক হয়েছে। তার বাবুরা দশটা দশের ট্রেনে এখানে এসে নামে। ডিপোজিট বিশ লাখ টাকা ছাড়িয়ে যাওয়ায় একজন অ্যাকাউট্যান্ট আসবেন শোনা যাচ্ছে। ...আসলে আমাদের হলো গিয়ে কেনাবেচার জায়গা। আটজন এম বি বি এস, সতেরোজন উকিল, একুশজন প্রাইমারি টিচার, একজন করে পোস্টমাস্টার, স্টেশনমাস্টার থাকায় আমাদের এই স্টেশনবাজার এলাকার বিরুদ্ধে অনেকেরই হিংসে। তাছাড়া একটা হেলথ সেন্টার আছে।...

আমাদের এখান থেকেই মাছ, মুড়ি, তাড়ি, ঠিকে ঝি, ভিখারি, ঢ্যাঁড়স ফার্স্ট লোকালে কলকাতায় যায়। কলকাতা থেকে লরিতে গম এলে এখানকার একান্নটা দশ ঘোড়ার গমকল গোঁ গোঁ আওয়াজ করে আটা বানায়।"

এ এক নতুন দেখা, নতুনভাবে দেখা। সাধারণত সুন্দরবন বলতে যে ছবি আমাদের চোখে ভেসে ওঠে, শ্যামলের কলম সেদিকে যায় না। বরং এক নতুন ভুবনের দিকে অগ্রসর হয়। বাদা জীবনের মূল কথাই হল কঠিন শ্রম। এই জীবনে

ফাঁক নেই, ফাঁকিও নেই। কিন্তু অবসর তো আসতেই পারে। সেই অবসর হিসেবেই বুঝি আসে এক ধরনের উদাসীন দার্শনিকতা। এটাকে ওদের এন্টারটেনমেন্ট বলা যেতে পারে। নানা অলৌকিক, আজগুবি কথা-কাহিনির রসে ডুবে থাকতে চায় মন। একদিকে যেমন দেখা যায় আধুনিক নগর সভ্যতা যেমন পা পা এগিয়ে আসছে, তেমনই পা পা পিছু হটছে প্রকৃতির আদিম সন্তানেরা। তাদের দেখছি যেন এক বিচিত্র পরিবেশে। শহরে আদবকায়দা, রীতিনীতি, আচারবিচার—সবই আছে, তবে একটু অন্যভাবে। যেমন এই পৃথিবীতে 'লিভ টুগেদার' কথাটা বিদেশি হলেও অচেনা নয়। ওই 'দখল' গল্পেই দাক্ষী আর ভবেন। ওদের সম্পর্ক কী? ওরা কি স্বামী স্ত্রী? তা নয়। তাই সন্তোষ টাকির মতো সদ্য জেলফেরত চোর দাক্ষীর জীবনে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে। যে আদিমতা দেখেছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে। নীচুতলার পৃথিবীতে নারীমাংস নিয়ে সেই আদিম সংঘাত, সংঘর্ষ, রক্তপাত, আবার নতুন ঘরবসতির দিকে যাত্রা। এখানেও অনেকটা তাই, এক নারী দুই পুরুষ—সভ্য সমাজের কাছে এ অবিশ্বাস্য, কিন্তু শ্যামলের ভুবনে যেন এটাই স্বাভাবিক। আর সাপকে যদি প্রতীক ধরি, তার অর্থ হওয়া উচিত সৃষ্টি। অজস্র বীজ থেকে যেমন ফসলের প্রাচুর্য, তেমনই অসংখ্য সাপের ছানা যেন নব উদ্যমে সৃষ্টির সম্ভাবনা। এক হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর যেন ফিরে আসার সংকেত। লেখক কি সেই আদিম সমাজে ফেরার ইচ্ছা রাখেন? মনে হয় তাই। নইলে সন্তোষ টাকি কেন বারবার দাক্ষীকে বলবে, 'তুই কে দাক্ষী, তুই আসলে কে?' দাক্ষী তো সেই পৃথিবী, যেখানে সভ্যতার আলো এখনও পৌঁছয়নি। অথবা এমনও বলা যায় যে, সেই জগৎ এতটাই আলোকিত, যেখানে আধুনিক সভ্যতা এখনও পৌঁছতেই পারেনি। সেই আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা, যা দূর অতীতে ছিল, সে যেন চলেছে ভবিষ্যৎ সমাজের দিকে।

জীবনের এই দুই রূপই শ্যামলের সাহিত্যের মূল উপজীব্য। তিনি বলেছেন, *"হাঁড়ির একটা ভাত টিপে যেমন সব কটা ভাত চেনা যায়—তেমনি আধা শহর আধা গঞ্জ—একখানা বড় গ্রাম উল্টেপাল্টে দেখেই আমার দেশ দেখা—মানুষ দেখা। এ দেখার শেষ নেই।"* (ভারতবর্ষের সঙ্গে দেখা) হ্যাঁ, তিনি দেখেছেন। সেটা অনেকটা মুগ্ধতা নিয়ে, বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে। একজন আপাদমস্তক নগর জীবনের বাসিন্দা, তিনি যখন বাদা জীবনে এলেন, সেখানকার প্রকৃতি, মানুষ, জীবনযাপন দেখছেন, তাঁর কাছে বিস্ময়ই স্বাভাবিক। কেননা শ্যামল ছিলেন বহিরাগত। বাইরের মানুষ নতুন কোনও অঞ্চলে পা রাখলে যেমন প্রতি পদে পদে মুগ্ধতা দেখা দেয়, যা দেখছেন তাতে বিস্ময়ের শেষ থাকে না, অনেকটা এই ধরনে শ্যামলের গল্পের শুরু হয়। তথ্যচিত্রের মতো সেই অঞ্চলের ভূগোল, ইতিহাসের বিবরণ দিয়ে গল্পের শরীর

নির্মিত হয়। বাদা পর্বের সাহিত্যে এ এক অভিনব আঙ্গিক শ্যামলের।

সত্যি বলতে কী, বাদা অঞ্চল তো বিস্ময়েরই খনি। এখানে প্রকৃতির মধ্যে, মানুষের মধ্যে আছে বুনো গন্ধ আর রহস্যময়তা। নদীর বুকে চাঁদের আলো পড়লে যেমন চিকচিক করে, মনে হয় কত সোনা- রুপো ঝলমল করছে, তেমনই এখানকার মাটির শরীরে, গাছের মধ্যে, মানুষের ভিতর ওইরকম কত সোনা-রুপোর ঝিলিক আছে। শুধু দেখার অপেক্ষা, কুড়িয়ে নেওয়ার অপেক্ষা। বাইরের লোকের কাছে এ এক আক্ষেপেরও বিষয়। যেমন 'কন্দর্প' গল্পে আছে, *"কলকাতা থেকে মাত্র পনেরো মাইল। আমার জন্য এই পৃথিবীটুকু আলাদা করা ছিল। ইস্ জীবনের কতখানি ব্যয় করার পর তবে আমি এখানে এলাম।"* শ্যামল এখানে জমির মায়া বুঝেছিলেন, জমি চেনার চেষ্টা করেছিলেন। বাদা জীবনে জমিই তো সব। জমিকে কেন্দ্র করেই মানুষের জীবনযাপন, আচার-আচরণ। ধান এখানকার সমৃদ্ধির প্রতীক। কারখানার লোহাপেটা কুবের এই অক্সিজেন ভরা পৃথিবীতে পা রেখেই জমির নেশায় পড়ে যায়। 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে শ্যামল এই জমির চরিত্র দেখতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে ঢুকে, মাটির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে। এই উপন্যাস যদি তাঁর বাদা জীবনে প্রবেশ হয়, তবে 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' হচ্ছে বাদা জীবন থেকে প্রস্থান। কুবের যেমন জমির নেশায় নিজের সংহতি নষ্ট করে ফেলে, বেহিসেবি হয়ে পড়ে তার জীবন। ঈশ্বরীতলায় এসে হয়তো বুঝেছেন, যতই চেষ্টা করুন, এ জীবন তাঁর নয়, এখানে যতই বাস করুন, জমির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলুন, মিলতে পারবেন না। একাত্ম হতে কোথায় যেন বাধা আছে। ফলে বাদা জীবন পর্ব তাঁকে শেষ করতেই হবে।

তবে শ্যামল বাদা পর্বে যা পেলেন, তার মূল্যও তো কম নয়। এক কথায় সেটা মানুষ। এখানকার মানুষের মধ্যে সারল্য আছে। তারা হাড়িয়া, তাড়ির নেশা করে, মিথ্যে কথা বলে, চুরি-চামারিতেও ওস্তাদ। আবার উদাসীন দার্শনিক হতেও বাধে না। এই জীবন তো বিস্ময়ের। 'কন্দর্প' গল্পের গণেশ বা 'পরী' গল্পের বিপিন ঠকবাজ, মিথ্যেবাদী হলেও গ্রামীণ পরিবেশে তাদের সারল্যই মুখ্য হয়ে ওঠে। আবার 'অন্নপূর্ণা' গল্পে প্রমীলাকে তার স্বামী হিগগড়ির বাজারে নিয়ে চলে, ব্যাপারীদের কাছে তার দেহ বেচা পয়সায় উপোসি সংসার বাঁচানোর তাগিদে। তখন মনে হয় না এ কী নিষ্ঠুরতা। মনে হয় এই-ই স্বাভাবিক। চরম দ্রারিদ্র্যেও মানুষ ভেঙে পড়ে না, বাঁচার পথ খোঁজে। আমাদের স্বভাব হল, যা কিছু ভালো, যা কিছু অসাধারণ, তা সবই করেছে বিদেশি লেখকরা। মার্কেজের 'সরলা এরেন্দিরা ও তার নিদয়া ঠাকুমার নিষ্ঠুর কাহিনি' পড়ে আহা-উহুর বন্যা বয়ে যায়। ম্যাজিক রিয়ালিজম বলে চিৎকার ওঠে। কিন্তু এ কাজটি কত সহজে শ্যামল করেছিলেন এই বাদা পর্বের

সাহিত্যে। সে নিয়ে কোনও শব্দও শুনি না। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আমাদের সবকিছুতে বিদেশি স্পর্শ না থাকলে বুঝি বিশ্বাসের চৌকাঠ পার হতে পারে না। ওই যে 'পরী' গল্পে বিপিন বিশ্বাস বেহালা বাজিয়ে পরি নামানোর কথা বলে, এটা শহুরে মানুষের কাছে হাস্যকর মনে হতেই পারে, কিন্তু বিপিনদের কাছে এটা গভীর বিশ্বাস। সে বিশ্বাসের ভিত বড়ো শক্ত।

বাদা জীবনে আমি বাস করেছি আত্মীয়তা সূত্রে। দেখেছি এখানকার লোকের মধ্যে স্বভাব-দার্শনিকতা। এখানে বাতাসে, ধূলিকণায় ভেসে বেড়ায় অজস্র গল্পের বীজ। পথের ধারে, গাছতলায়, হাটের আটচালায় বসে আছেন কিছু বিষ্ণু শর্মা। তাঁরা কোনও পারিশ্রমিক ছাড়াই শোনাচ্ছেন সেইসব গল্প। তাতে আজগুবি ব্যাপারটাই বেশি। কিন্তু ওরা জোর দিয়ে বলবে, না এ সত্য ঘটনা। প্রতিবাদ করতে গেলে শুনতে হবে মুখ খিঁচুনি, খিস্তি খেউড়ও বিচিত্র নয়। শহুরে লোক বলে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও শুনতে হবে। তবে একবার বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে ওদের হাত ধরে পৌঁছে যাওয়া যাবে এক অলৌকিক জগতে। যেখানে বাস্তব ও রূপকথা হাত ধরাধরি করে হাঁটে। এই জগতের কথাই তো শুনেছি শ্যামলের গল্পে উপন্যাসে। বিন্দুতে সিন্ধু স্বাদ বাদা জীবনে খুব অস্বাভাবিক নয়। সুন্দরবনের মানুষ ফসল ফলিয়েছে, কিন্তু নিজেরা কি সমৃদ্ধ হতে পেরেছে? দারিদ্র্য সেখানে নিত্যসঙ্গী। কিন্তু জীবন এখানেই থেমে যায়নি। মানুষের ভাবনা আছে, কল্পনা আছে। সেগুলো পাখির মতো ডানা মেলে দেয় বাস্তব পৃথিবী ছাড়িয়ে দূরে, অনেক দূরে—মাণিকজ্বলা দেশের ওপারে। এই যে 'চন্দনেশ্বরের মাচানতলায়' গল্পের অমৃত ভগবান দেখতে যায়, এটা অভিনব ব্যাপারই নয়। দারিদ্র্যের চাপে পিষ্ট হওয়া মানুষ কার উপর ভরসা রাখবে, ভগবান ছাড়া। অনেক না পাওয়ার যন্ত্রণা, না দেখার আক্ষেপ মেটানো যায় কল্পনার পাখায় ভর করে। সেখানে আর কোনও আক্ষেপ থাকে না, দুঃখও থাকে না। লেখক যতবার অমৃতকে বাস্তব পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছেন, অমৃত তাতে কর্ণপাত করছেই না, বরং ততই সে ফিরে যাচ্ছে তার কল্পনার জগতে, তার কল্পিত ঈশ্বরের কাছে, কিছু চাওয়ার নেই সত্ত্বেও। এটা স্বাভাবিক বলছি এই কারণে যে, বাদায় দেখা যায় প্রায়ই কারও উপর ঈশ্বরের ভর হয়, কাউকে পরি পায়, ভূতে বা জিনে ধরা তো আছেই। এগুলো এক একটা অবসেশন। না পাওয়ার ক্ষেত্রপূরণ হিসেবে দেখা দেয়। সব পেয়েও যেভাবে কুবের চাঁদ ধরতে ওঠে তালগাছের মাথায়। কিন্তু তার তো সেই কল্পনা নেই। সেই আবেগও নেই। কুবের আদ্যোপান্ত শহুরে মানসিকতার মানুষ। ফলে যা অনিবার্য তাই ঘটে। অথচ অন্যদিকে দেখি, 'পরী' গল্পের বিপিন বিশ্বাসকে। সে তো বিশ্বাস করে বেহালা বাজিয়ে পরি নামাতে পারে। পরি নামে তার কল্পনার ভূমিতে। খেলা করে, হাসে নাচে, গান গায়। এক গভীর বিশ্বাস থেকে

সংগ্রামের প্রতীক। এই সুন্দরবনের ফসলের ভাণ্ডার তো একদিনে গড়ে ওঠেনি। অনেক লড়াই হয়েছে। সে লড়াই প্রকৃতির সঙ্গে, ভয়াল জীবজন্তুর সঙ্গে, রোগভোগের সঙ্গে, শোষণ-অবিচারের সঙ্গে। অনেক কান্না-ঘাম-রক্ত ঝরেছে। তবেই তো মিলেছে প্রার্থিত ভূমি। অনেকে বলেন সুন্দরবনের নদীনালার জল এত লবনাক্ত কেন? তার উত্তর ওখানকার মানুষের মুখেই পেয়েছি, এ লবণ তো শুধু সমুদ্রের নয়, এতে অনেক মানুষের চোখের জল মিশে আছে। এই সংগ্রাম আক্ষরিক অর্থে যুদ্ধ ছিল না, বরং ছিল ধৈর্যের, স্থৈর্যের। সেই সংগ্রামের প্রতীক হিসেবেই যেন দেখলাম শ্যামলের 'যুদ্ধ' গল্পটি। গোটা সুন্দরবনের লড়িয়ে মানসিকতা যেন উঠে এল এই একটা গল্পে। সাপের খাদ্য ব্যাঙ, মানুষের লোভের হাত সেখানে থাবা বসাতে চায়। ফলে বেধে যায় লড়াই। যাকে এক কথায় বলা যায় জীবন সংগ্রাম। তবে চিরাচরিত লড়াই সংগ্রামের রূপ এ গল্পে আলাদা। মারামারি কাটাকাটির কোনও ব্যাপারই নেই এখানে। ব্যাঙ ধরতে এসে গল্পের চরিত্র হাজরা মুখোমুখি পড়ে যায় ফণা তোলা সাপের। ব্যাঙ ধরে হাজরার সংসার চলে, আর সেই ব্যাঙ হল সাপের খাদ্য। দুজনেরই প্রচণ্ড তাগিদ। তাই দুজন মুখোমুখি। উদ্যত। কারও চোখের পলক পড়ে না। একেবারে সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো। সাপ তার উদ্যত ফণা কিছুতেই নামাবে না। সে যেন ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে হাজরার। আর হাজরাও ব্যাঙ ছাড়বে না। কারণ জীবটি তার কাছে বাঁচার রসদ। দুই প্রাণির লড়াই এই স্থির স্থবির সময়ের সঙ্গে। গোটা সুন্দরবনের জনজীবন, বসতি, জঙ্গল কেটে আবাদ করার প্রস্তুতি, সবটাই যেন দেখা গেল এই গল্পে। সেখানেও তো আছে আদিম প্রকৃতির সঙ্গে, ভয়াল জীবজন্তুর সঙ্গে দাঁতে-নখের লড়াই। যুদ্ধ নামটি প্রতীকি। পৃথিবী বদলে গেলেও রক্ষক আর ভক্ষকের চিরাচরিত লড়াইয়ের কোনও বদল নেই।

পৃথিবী যত আধুনিক হচ্ছে, তার ধরনধারণও পালটে যাচ্ছে। সাপ যেখানে উর্বরতার প্রতীক সেই পৃথিবীতেই দেখা যাচ্ছে সাপ অর্থনীতিরও উপাদান। সাপের বিষ, চামড়াও সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এভাবে সাপ সম্পর্কে যে চিরাচরিত ভয়, সেটা কেটে যাচ্ছে। শ্যামল কি এদিকটা লক্ষ করেননি? তিনি তো বদলে যাওয়া সুন্দরবনের বাসিন্দা হয়েছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন কীভাবে এই বদল ঘটছে। তাঁর 'কে আসেনি' গল্পে সাপের চামড়া হয়েছে বিপণনের উপাদান। এজন্য বিপদও তুচ্ছ হয়ে যায়। পাশাপাশি 'ধানকেউটে' গল্পে সেই সাপই এসেছে সুখ সমৃদ্ধির সঙ্গে আদিমতার প্রতীক হয়ে। ফসলের প্রাচুর্যের সঙ্গে ন্যায়-নিষ্ঠা-নিয়ম-সামাজিকতা ধুয়ে যেতে পারে। অর্থ যার আছে, তার কাছে সবই সুলভ, এমনকি নারী শরীরও। সুখ সমৃদ্ধির সঙ্গে আদিরসের সম্পর্ক যে গভীর সেটাই যেন সাপের প্রতীকে দেখা যাচ্ছে।

শ্যামলের বাদা পর্বের লেখায় আমরা যা পেয়েছি, সেটা হল মুলত মানুষ। এত বিচিত্র মানুষের আনাগোনা বোধহয় তাঁর অন্য কোনও পর্বের লেখায় নেই। বিচিত্র তাদের নাম, পেশা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বেঁচে থাকার কারণে বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র চেহারা প্রকাশিত হয়। এদের একটু কাছে থেকে দেখলে আর গল্প তৈরি করতে হয় না। এরাই গল্প, গল্পের চরিত্র। যেমন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, *"গল্প আসলে যে কোন জিনিস নিয়েই লেখা যায়। কারণ, আমার গল্পের কাহিনী একটা যা-কিছু থাকলেও সেটা প্রধান নয়। সেটা জীবনের কাঠামো মাত্র। সেই কাঠামোতে আমি আমার আবিষ্কৃত কোন জীবনবিশ্বাসের ময়াম দিয়ে শরীর বানাই।"* (ভারতবর্ষের সঙ্গে দেখা)। 'জীবনবিশ্বাস' কথাটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিশ্বাসই তো মূল শিকড়। তারপর ডালপালা, লতাপাতা। আর এই বিশ্বাসের অপর নাম শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। এক ধরনের বিপন্নতা থেকে তাঁর সাহিত্য উঠে দাঁড়িয়েছে বারবার। বাদার মানুষ যেভাবে বিপন্নতা থেকে বেঁচে ফিরেছে আলোকিত সকালের দিকে। শ্যামল নিজেও তো কম বিপন্ন ছিলেন না। বারেবারে বাসাবদল ঘটেছে তাঁর। কখনও গ্রামজীবন, কখনও শহুরে পরিবেশে তিনি চলেছেন। কর্মজীবনেও তাই। সুখের চাকরি ছেড়েছেন প্রায় হাসতে হাসতে। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে পৌঁছেছেন তাঁর স্বেচ্ছাকৃত মানসিকতায়। বিপন্নতা তাঁর অন্দরমহলেই ঘাপটি মেরে ছিল। তিনি বলেছেন, *"বিপন্ন হও, বিপন্ন হও, বিপন্ন হও। ইচ্ছাকৃত ভাবে না। অজ্ঞাতে হয়ে যাও। তার থেকে যা উঠে আসবে আর যা দেখতে পাও, তা লিখো না। যা ঘটলেও ঘটতে পারে, তা-ই লিখো।"* (শ্যামল গঙ্গেপাধ্যায়ের ভাষণ। চন্দননগর গল্পমেলা। ১৯৯১) এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, তাঁর নিজের বিপন্নতা কি ইচ্ছাকৃত? উত্তর অজানা। তবে এই বোধ যে বাদাজীবন থেকে তাঁর ভিতরে প্রোথিত, তা কি অস্বীকার করা যায়? বাদাপর্বের লেখায় এই বিপন্নতারই নানা রূপ দেখা গেল। সুন্দরবনের জনচিত্তের যে দিকটি এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল, সেটাই তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের ম্যতা চকচক করে উঠল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কলমে।

অনিল ঘোষ

কবি, ছোটগল্পকার ও প্রাবন্ধিক।